আত্মপ্রকাশ প্রকাশনা

দেশ, জাতি ও জনগণের প্রতি
জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ

আগামী নির্বাচন সম্পর্কে "জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ"-এর বক্তব্য

সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশার নির্বাচন; জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার নির্বাচন

সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং তাদের গোলামদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীনে সবরকম নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করুন!

গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্বাধীনে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন!

বিগত ৩৭ বছর আমরা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী এবং তাদের নানা রাজনৈতিক দল ও জোটের শাসন দেখেছি। তারা দেশ বিক্রি করে এদেশকে সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে, এই জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ও সম্ভাবনা ধ্বংস করেছে। তারা গ্রামীণ শোষক-নিপীড়কদের ক্ষমতা ও শোষণ-নিপীড়ণ ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলে ব্যাপক কৃষক জনতার রক্ত শুষে নিয়েছে। তারা মুষ্টিমেয় কয়েকটি গ্রুপের সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

তাদের ৩৫ বছরের শোষণ-নিপীড়ন, দুর্নীতি ও দুঃশাসনে অর্থনৈতিক সংকট যখন চরমে পৌঁছে, প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর মধ্যকার হানাহানি গভীর সংকটের জন্ম দেয়, যখন এদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার তাগিদে শ্রমিক, কৃষক জনগণ বিদ্রোহ করতে শুরু করে, তখন প্রতিক্রিয়াশীলদের শোষণ ও নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। আর ঠিক তখন এক এগার'র ক্যু দেতা সংঘটিত হয়।

এই সাম্রাজ্যবাদী নীলনক্সার সীমাবদ্ধতা বা সংকট হলো:

ক. এই সরকার কোন বৈধ সরকার নয়। তাদের নিজেদের গড়া সংবিধানের আওতাতেও তারা অবৈধ। এই সরকার স্রেফ জরুরী আইনের বলে টিকে আছে। এভাবে দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাদের সামনে দু'টি পথ খোলা রয়েছে: হয় নির্বাচন দিতে হবে, নতুবা সামরিক আইন জারি করতে হবে।

খ. এই সরকার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এমন অনেক কাজ করেছে যা তার আইনগত এখতিয়ারের বাইরে। ফলে এই সরকার এবং তার এখতিয়ার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বৈধতা ছাড়া কেবল সমগ্র পরিকল্পনাই ভেস্তে যেতে পারে তা-ই নয়, এই সরকারের সমর্থকদের হয় জেলে যেতে হবে না হয় দেশ ছাড়া হতে হবে।

গ. নির্বাচন দিলে তাদের সংকট হচ্ছে, আগামী সরকারকে দিয়ে এই সরকারের বৈধতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, আত্মরক্ষার্থে এই সরকারের লোকেদের আগামী সরকারে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের গৃহীত নিরপেক্ষ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই নির্বাচনে জনগণের জন্য কিছু পাওয়ার নেই; আরও বেশী বেশী ক্ষুধা-দারিদ্র, দমন-নিপীড়ন ছাড়া। এই নির্বাচন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর শোষণ-নিপীড়ন-দমনমূলক শাসন ব্যবস্থাটাকে জোরদার করবে মাত্র।

সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের গোলামদের কর্তৃত্বাধীনে অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদী নীলনক্সা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা, ব্যাপক জনগণকে আবারো ধোঁকা দেয়া; যাকে এক কথায় বলা যায়, জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা।

আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করি। আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই: সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের গোলামদের কর্তৃত্বাধীনে কোন নির্বাচন নয়।

আমরা কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি ও নিপীড়িত জনগণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীনে নির্বাচন চাই। কারণ কেবল জনগণের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীনেই একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব।

সিভিল পোষাকে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আশীর্বাদে বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীলনক্সা ও নির্দেশে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ তার কেনা গোলামদের সাহায্যে ভঙ্গুর শোষণ-নিপীড়ণমূলক ব্যবস্থাটাকে রক্ষা ও মেরামত করার জন্য নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করে।

সাম্রাজ্যবাদের নীলনক্সার লক্ষ্য ছিলঃ

ক. প্রথমতঃ তার পোষা কুকুরদের কামড়াকামড়ি মুগুরের বাড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা করা, যাতে পুরো প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসন ব্যবস্থাটা উচ্ছন্নে না যায়। এজন্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর ক্ষমতাবান নেতা-নেত্রীদের ধরে জেলে ঢোকানো হয়।

খ. দ্বিতীয়তঃ প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি, রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার ভগ্নদশা মেরামত ও শক্তিশালী করা, যাতে আবারো তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম না হয়। বিশেষতঃ তার কেনা গোলামদের রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ক্ষমতাশালী করা যাতে, পোষা কুকুরদের কামড়া কামড়ি লাগলে লাগাম টেনে ধরা যায়। এজন্য মাইনাস টু, কিংস পার্টি গঠন করার চেষ্টা হয়েছে, দল নিবন্ধন, নির্বাচনী সংস্কার, উপজেলা নির্বাচন ইত্যাদি করা হয়েছে। এখনও নিরাপত্তা কাউন্সিল, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি পরিকল্পনা রয়েছে।

গ. তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রকে গণ প্রতিরোধ দমনে আরো সক্ষম করে তোলা। এজন্য জরুরী অবস্থা জারি করা হয়, নিপীড়ন ও দমন মূলক শ্রম ও সন্ত্রাস দমন আইন করা হয়, র‍্যাব-পুলিশকে ক্রস ফায়ারের নামে হত্যার লাইসেন্স দেয়া হয় এবং এই গণহত্যা জোরালো করা হয়।

ঘ. চতুর্থতঃ তীব্র শোষণ-নিপীড়ন ও লুণ্ঠনের যেসব প্রকল্প ও কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা সংকট গ্রস্থ হয়েছে তা মেরামত করা এবং গণরোষের ভয়ে অথবা চরম দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে যে সব চরম গণবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সংস্কার ও প্রকল্পগুলো অতীতের সরকারগুলো বাস্ত বায়ন করতে সক্ষম হয়নি তা দ্রুত কার্যকর করা, যাতে এদেশকে অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় এবং তা আরো গভীর করা যায়।

প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।সামরিক আইন জারি করলে সংকট হচ্ছে, এই ব্যবস্থার অকার্যকারিতা ৬০ ও ৭০ দশকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে, সাম্রাজ্যবাদ নিজেই সেই পুরনো ও অকার্যকর ওষুধ; যার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে পরিচালিত করে; তা আবারো প্রয়োগ করতে আগ্রহী নয়।

এরকম এক সংকট থেকে উত্তরণে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কেন্দ্রীয় কাজ হলোঃ

এই সরকার এবং তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান, আগামী সরকারে অংশীদারিত্ব এবং তাদের গৃহীত সংস্কার প্রকল্পগুলো নিশ্চিত করার শর্তে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর সাথে একটা আপোসরফা করা। প্রতিক্রিয়াশীল জোটগুলোর শক্তিসামর্থ্যের সাথে পেরে না ওঠায় এখন তারা কিংস পার্টি গঠন, মাইনাস টু ইত্যাদি ফর্মুলা বাদ দিয়েছে। "সংলাপ" নামের প্রহসনের আড়ালে এই আপোষরফার দরকষাকষি চলে। এই দরকষাকষি ও গোপন আপোসরফার প্রক্রিয়ায় সরকার প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোকে যতটুকু ছাড় দেয়া সম্ভব তা দিয়েছে। বিনিময়ে তারা চেয়েছে সকল দল যেন নির্বাচনে অংশ নেয় এবং আগামী সংসদে তাদের বৈধতা দেয়। তবে বর্তমানে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বধানে তারা মহাজোটের সাথে একটি গোপন সমঝোতায় পৌছেছে বলে মনে হয়। ফলে চার দলীয় জোট তাদের নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা করছে। এরকম অবস্থায় সরকার জরুরী অবস্থার মধ্যে নির্বাচন দেয়ার প্রশ্নে অটল যাতে লাগাম নিজেদের হাতে থাকে এবং তাদের নীলনক্সা বাস্তবায়ন বিঘ্নিত না হয়। এক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে চলেছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আগামী নির্বাচন সাম্রাজ্যবাদ ও তার গোলামদের শোষণ-নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাটা রক্ষা, মেরামত ও শক্তিশালী করার নীলনক্সার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা সাম্রাজ্যবাদের নীলনক্সা বাস্ত বায়নকারী অবৈধ ক্যুদেতা, অবৈধ সরকার এবং তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়ার নির্বাচন। অনিবার্যভাবে আগামী নির্বাচন হবে একটি অশুভ আঁতাতের পাতানো নির্বাচন। সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিতব্য এই নির্বাচন হলো সাম্রাজ্যবাদী নির্বাচন, এ রকম একটা নির্বাচন অবাধ ও

আমরা জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ এদেশের শোষিত-নিপীড়িত মুক্তিকামী জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই, আসুনঃ

- **সাম্রাজ্যবাদী; জাতীয় বেঈমানীর নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করি!**
- **সাম্রাজ্যবাদী নীলনক্সা এবং সরকারের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলি!**
- **সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি সত্যিকার স্বাধীন-গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অধিকার এবং একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণক্ষমতা অর্জনের সংগ্রাম বেগবান করি!**
- **একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করি!**

আাসুন, আমরা সোচ্চার কণ্ঠে আওয়াজ তুলিঃ

- **জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার কর!**
- **গ্যাসব্লক ইজারা, কয়লা নীতি, পাটকল বন্ধ, হাইব্রীড বীজ বিক্রি, সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষানীতি, শ্রম ও সন্ত্রাস দমন কালো আইনসহ এই সরকারের গণবিরোধী অধ্যাদেশ ও কর্মকাণ্ড বাতিল কর!**
- **দ্রব্যের দামকমাও! মজুরী বাড়াও! কৃষককে ভর্তুকী দাও!**
- **রাজনৈতিক দমন, বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড, শ্রমিক ও কৃষক, সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উপর দমন-নিপীড়ন বন্ধ কর!**
- **সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা বাস্তবায়নে জড়িত ও দায়ী ব্যাক্তিদের বিচার কর!**

জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ

ঘোষণা

(দ্বিতীয় খসড়া, ৭ নভেম্বর ২০০৮)

১

ক.

মুঘল ভারতের শেষদিকে পুঁজিবাদ অর্থাৎ, উন্নততর সমাজ বিকাশের প্রাথমিক শর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু, বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি সেই পুঁজির সম্ভাবনা ধ্বংস করে, জমিদারি ব্যবস্থার আকারে পুরনো সামন্তবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখে। বেনিয়া মূলধনও জমিদারীতে ব্যয়িত হয়ে যায় এবং তার পুঁজিতে রূপান্তর ব্যহত হয়। সামাজিক বিকাশ ও অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

একসময় উপনিবেশিক ভারতে সামন্তবাদের ভিত্তির উপর পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে, কিন্তু আজকের পূর্ববাংলা অঞ্চলটি পরিণত হয় কোলকাতার পশ্চাদভূমিতে। ফলে, এখানে পুঁজিবাদের বিকাশ হয় অবদমিত।

উপনিবেশিক ভারতে পূর্ববাংলা অঞ্চলের জনগণ সবসময় সকল বৈদেশিক হামলা ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং প্রতিরোধ চালিয়েছেন। এ অঞ্চলের জনগণের ইতিহাস হচ্ছে বীরত্বপূর্ন সংগ্রামের ইতিহাস। পূর্ববাংলার জনগণ বৃটিশ উপনিবেশবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ধর্মীয় অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন।

ভারতে উপনিবেশবাদের দালাল এবং সামন্ত বাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এক একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিকশিত হয়। এই পুঁজির মালিক হলো ভারতের আমলাতান্ত্রিক বা বড় বুর্জোয়া শ্রেণী। এই বড় বুর্জোয়া শ্রেণী (মুসলিম ও অমুসলিম বুর্জোয়া) নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থেই এক সময় স্বাধীনতার দাবী তুলে। পরে স্ব স্ব স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আন্দোলনকে বিভক্ত করে। তদস্বত্ত্বেও জনগণের বিদ্যমান ছিল। এ শাসকশ্রেণীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় নিপীড়ন উপনিবেশিক শোষণের রূপ নেয়।

এভাবে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির উৎখাত সত্ত্বেও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জিত হয়নি। একটি উন্নত ও প্রগতিশীল, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন সত্য হয়নি।

খ.

এ প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলায় অবাঙ্গালী বড় বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের শোষণ-নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে বিকশিত হতে থাকে। পূর্ববাংলার দালাল বুর্জোয়া ও সামন্তরা নিজ বিকাশের স্বার্থে জাতীয় নিপীড়নের বিরোধীতা করে। জনগণের নিজস্ব সংগঠন ও শক্তির অভাবে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়া এবং সামন্তদের প্রতিনিধি আওয়ামীলীগের হাতে চলে যায়। তারা জনগণের জঙ্গী আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ ও নির্বাচনের কানাগলিতে প্রবেশ করায়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি উপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার উপর গণহত্যা ও অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

পূর্ববাংলার জনগণ জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের জন্য ১৯৭১ সালে বিদ্রোহ করেন। তাঁরা পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, লক্ষ লক্ষ জনগণ প্রাণ হারান, তাদের ধন-সম্পত্তি, সহায়-সম্ভ্রম লুঠ হয়।

পূর্ববাংলার দালাল বুর্জোয়া, সামন্ত শ্রেণী এবং তাদের প্রতিনিধি আওয়ামীলীগ জনগণকে অরক্ষিত রেখে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ পুতুল সরকার ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা জনগণকে দাবীয়ে রাখা ও তাদের ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব চালাবার জন্য বিভিন্ন সশস্ত্র ভাড়াটে বাহিনী গঠন করে। তারা প্রায় অর্ধলক্ষ দেশপ্রেমিক মুক্তিকামী জনতাকে হত্যা ও গুম করে। আওয়ামীলীগ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক এবং তাদের উপনিবেশিক প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের শোষণ-লুণ্ঠণ আর অত্যাচারে অল্প সময়ের মধ্যেই জনজীবনে নেমে আসে চরম অরাজকতা। কয়েক লক্ষ মানুষ দূর্ভিক্ষে অনাহারে মারা যান আর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের তাবেদাররা রাতারাতি অঢেল অর্থ ও সম্পদের মালিক হয়ে ওঠে।

১৯৬০ দশক হতে বিকাশমান পূর্ববাংলাস্থ বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ রাষ্ট্রীয়করণ করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের (বা পূর্ববাংলার) আমালতান্ত্রিক পুঁজিবাদ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ আকারে রূপ লাভ করে। ফলে বড় বুর্জোয়াদের একাংশ দ্রুত আমলা বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হয়। এভাবে উপনিবেশিক-আধাসামন্ত বাদী ব্যবস্থার ভিত্তির উপর আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বিকশিত হতে শুরু করে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব লাভের জন্য আমলা ও দালাল বুর্জোয়া অংশের মধ্যে স্থায়ী দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে।

দালাল ও আমলা বুর্জোয়া এবং তাদের নানা উপদলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে আন্ত :সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ, রুশ-ভারতের সাথে মার্কিনের দ্বন্দ্ব) ক্রিয়াশীল হয়। তথাকথিত "সৈনিক-জনতার বিপ্লব" রুশ-ভারতের তাঁবেদার মুজিব সরকারের উৎখাতের মধ্যদিয়ে আমলা বুর্জোয়রা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দখল করে। মার্কিন পরাশক্তি, পাক-সৌদি ও চীনের সমর্থনপুষ্ট সামন্তবাদীদের প্রতিনিধি আওয়ামীলীগ ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলি বর্জন করে। তারা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে জনগণের উপর সংসদীয় একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়। এভাবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম আবারো অন্ধকারে পথ হারায়।

ঙ.

বলাবাহুল্য, নির্বাচন ও সংসদীয় পদ্ধতির মধ্যে আমলা ও দালাল বুর্জোয়া ও তাদের নানা উপদলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেনি। যে কোন প্রকারে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আওয়ামীলীগ ও বিএনপি-র নেতৃত্বে বড় বড় সামরিক-বেসামরিক আমলা, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সামন্তবাদী এবং তাদের প্রতিনিধি নানা রাজনৈতিক দলগুলো দু মেরুতে বিভক্ত হয়ে মরিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তাদের বৈদেশিক প্রভুদের দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। তবে এসব দ্বন্দ্বে চূড়ান্তভাবে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান হিসাবে সেনা বাহিনী।

শাসকশ্রেণীর মধ্যকার এই দুই বৃহৎ উপদলের মধ্যকার তীব্র বিরোধের এমন নজির খুব কম দেশেই দেখা যায়। তীব্র বৈরীতার কারণে শাসকশ্রেণী তার উপদল-নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে গভীর সংকটে পড়ে। তারা আপাতঃ মীমাংসার জন্য আমলাতন্ত্রের দ্বারস্থ হয় এবং তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা আমদানী করে। তত্ত্বাবধায়করা শাসকশ্রেণীর দলাদলি "নিরপেক্ষ ও অবাধ" নির্বাচনের মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌছানোর চেষ্টা করে। কিন্তু, তা ব্যর্থ হয়। সংসদীয় স্বৈরাচারের ১৬ (১৯৯০-২০০৬) বছরে নির্বাচন, প্রহসনের নির্বাচন, নির্বাচনের ফল

বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম উপনিবেশবাদীদের বাধ্য করে তাদের সমর্থক ও সহযোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর (মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস) নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে। এভাবে পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি হয়।

এদিকে, পূর্ববাংলার মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর বিকাশের দু'টি বাধা ছিল, একটি হলো বৃটিশ উপনিবেশবাদ আর একটি হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন। পূর্ববাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে এবং মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের পাকিস্তান দাবীর পিছনে ঐক্যবদ্ধ করে। তারা পাকিস্তানে যোগ দেয় এবং এভাবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের প্রদেশে পরিণত হয়।

বাঙ্গালী বুর্জোয়া ও সামন্তদের (যারা খুবই সংখ্যাল্প) চেয়ে বহুগুণ বিকশিত অবাঙ্গালী মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তরা স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে। বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদের নিকট হস্তান্তর করে। বৃটিশ তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের মাধ্যমে পুরনো উপনিবেশিক রাষ্ট্র বজায় থাকে। এই রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ, অবাঙ্গালী বড় বুর্জোয়া এবং সামন্ত বাদীদের স্বার্থরক্ষকে পরিণত হয়। অবাঙ্গালী মুসলিম বড় বুর্জোয়া ও সামন্তরা রাষ্ট্রযন্ত্রের একচ্ছত্র মালিকানা লাভ করে এবং নিজ শ্রেণী বিকাশের অবাধ সুযোগ পায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় বড় বুর্জোয়াদের একাংশ, আমলা বুর্জোয়ারা দ্রুত বিকশিত হয়। তারা সামরিক ক্যুদেতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দখল করে। তারা কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের গভীরতর করার স্বার্থে খোদ কৃষকের হাতে জমি দেয়ার পরিবর্তে ছোট ও মাঝারি জমিদার-জোতদার-মহাজনী ব্যবস্থাকে সংহত করে। এভাবে পূর্ববাংলাসহ পাকিস্তানে আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা নতুনরূপে বজায় থাকে।

এ পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র জাতীয় ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য স্বায়ত্বশাসন কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের পরিবর্তে একে অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করে। এভাবে এখানে প্রথম থেকেই জাতীয় নিপীড়ন ও শোষণ

এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ পূর্ববাংলায় উপনিবেশ স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী যৌথবাহিনীর ছদ্মবেশে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পূর্ববাংলা দখল করে নেয়। তারা উপনিবেশিক কায়দায় পূর্ববাংলায় আওয়ামীলীগের পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসায়। নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান গড়ে তোলে। নানা অসম চুক্তির মাধ্যমে এবং অবৈধ পথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

বিশ্ব পরাশক্তি হিসাবে রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে সাহায্য করে এবং তাদের মাধ্যমে পূর্ববাংলার উপর প্রধান্য বিস্তার করে।

ক্ষমতাসীন দালাল বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা সামন্তবাদকে রক্ষা করে এবং কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের ফলে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে যায়।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার বিশ্বাসঘাতকরা আন্তর্জাতিক স্বিকৃতি, জাতীয় পতাকা আর মানচিত্র দিয়ে এই পরাধীনতাকে আড়াল করে। জনগণকে ধোকা দেয় এবং বিভ্রান্ত করে। এভাবে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানি উপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্ট শক্তির উৎখাত সত্ত্বেও জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি; পশ্চাদপদতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি উন্নত জাতি হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেছে।

গ.

এদেশের জনগণ প্রথম থেকেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের তাবেদার আওয়ামীলীগের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম শুরু করেন।

দেশবিক্রেতা মেজর জিয়ার সামরিক সরকারের সময়কালে একসারি ক্যু, পাল্টা-ক্যু এর ঘটনার মধ্যদিয়ে এই আমলা ও দালাল বুর্জোয়া এবং তাদের বৈদেশিক প্রভুদের দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়। এভাবে এদেশের উপর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উপনিবেশিক আধিপত্য খর্ব হয়ে আধা-উপনিবেশিক রূপ নেয়, রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য খর্ব হয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই হলো বাংলাদেশের (পূর্ববাংলার) সমসাময়িক সমাজ। কিন্তু, তথাকথিত "সৈনিক-জনতার বিপ্লব" জাতি ও জনগণের মুক্তি আনেনি, বয়ে এনেছে নতুন শৃঙ্খল।

ঘ.

জিয়া সরকারের উৎখাত এবং এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারী শাসনকালে একসারি সামরিক ক্যুদেতার মধ্যদিয়ে পুনরায় পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও তাদের দালাল; আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের প্রতিনিধি সামরিক-স্বৈরাচার এরশাদ সরকার রাখঢাকহীন সর্বগ্রাসী শোষণ-লুণ্ঠন করে। ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করার জন্য জনগণের উপর নির্মম জুলুম-অত্যাচার করে। কিন্তু, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য জনগণ বীরত্বের সাথে স্বৈরাচার বিরোধী এক জঙ্গী সংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

জনগণের প্রতিনিধি সম্বলিত শক্তিশালী সংগঠন ও নেতৃত্ব না থাকায় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের প্রতিনিধিত্বকারী অপর উপদলসমূহ যথা: বিএনপি, আওয়ামীলীগ ও তাদের লেজুড় রাজনৈতিক দলগুলো এ জঙ্গী সংগ্রাম ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করে। জনগণের বিদ্রোহের মুখে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল বড় বুর্জোয়াদের আঁতাতের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচারী এরশাদ বড় বুর্জোয়াদের অপর প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, যাতে জনগণের সংগ্রাম বিপ্লবী খাতে প্রবাহিত না হয়।

গণআন্দোলনের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ, সম্পসারণবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা রূপ পেয়েছিল– তা এই আমালাতান্ত্রিক বুর্জোয়া

বর্জন, সংসদ অকার্যকর করে আন্দোলনের নামে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, এর মধ্যেই সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের ক্যু, রাষ্ট্রের দলীয়করণ, ইলেকশান ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এই সমাধান অযোগ্য বৈরীতা প্রতিফলিত হয়েছে।

চ.

৩৫ বছরের, বিশেষতঃ বিগত ১৬ বছরের শোষণ-নিপীড়ন, দুর্নীতি ও দুঃশাসনে অর্থনৈতিক সংকট যখন চরমে পৌঁছে, ২০০৬ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর মধ্যকার হানাহানি গভীর সংকটের জন্ম দেয়, যখন এদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার তাগিদে শ্রমিক, কৃষক জনগণ বিদ্রোহ করতে শুরু করে, তখন প্রতিক্রিয়াশীলদের শোষণ ও নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। আর ঠিক তখন এক-এগারোর ক্যু দেতা সংঘটিত হয়।

সিভিল পোষাকে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আশীর্বাদে বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশা ও নির্দেশে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ তার কেনা গোলামদের সাহায্যে ভঙ্গুর শোষণ-নিপীড়ণমূলক ব্যবস্থাটাকে রক্ষা ও মেরামত করার জন্য নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করে।

গত ৩৭ বছরের এই বড় বুর্জোয়াদের নিজেদের ইতিহাস হলো সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর কাছে দেশবিক্রি ও জাতীয় পরাধীনতার ইতিহাস। পশ্চাদপদ সামন্তবাদী ব্যবস্থা, অনুন্নয়নের যাঁতাকলে জনগণকে পিষ্ট করার ইতিহাস। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য, উন্নত ও প্রগতিশীল জাতি গঠনের জন্য সংগ্রামরত জাতি ও জনগণের উপর দমনপীড়নের ইতিহাস। জাতি ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিয়ে আমলা ও দালাল বুর্জোয়াদের নানা উপদলের মধ্যকার তীব্র সংঘর্ষ ও স্থায়ী সংকটের ইতিহাস।

এই সংকট ও সংঘর্ষ হতে তাদের কোন মুক্তি নেই। যতক্ষণ না এদেশের জনগণ তাদের উৎখাত করে মুক্তি না দিচ্ছে।

এই আপাদমস্তক সংকটগ্রস্ত ও সংঘর্ষে লিপ্ত, ক্যানসার সদৃশ শাসকশ্রেণী সমগ্র সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। এর আশু অপসারণই সমাজকে বাঁচাবার পথ। এই অবস্থা জনগণের বিপ্লবী সংগঠন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য অবস্থাকে পরিপক্ক করে তুলেছে।

২

ফখরুদ্দিনের উপদেষ্টা সরকার হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আজ্ঞাবহ সরকার। এ সরকার হচ্ছে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের আওতায় সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ব্যবস্থায় আত্মীকৃত সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত মিত্র সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্ত ক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এ সরকার দেশের গুরুত্বপূর্ণ **রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক সংস্কারের সাম্রাজ্যবাদী নীলনক্সা বাস্তবায়ন করে। এইসব সংস্কার এদেশকে উপনিবেশিক কায়দায় শোষণ-নিপীড়নের পথে চালিত করছে।**

সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এই নীলনকশার নিম্নোক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

প্রথমতঃ তার পোষা কুকুরদের কামড়াকামড়ি মুগুরের বাড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা করা, যাতে পুরো প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসন ব্যবস্থাটা উচ্ছন্নে না যায়। এজন্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর ক্ষমতাবান নেতা-নেত্রীদের ধরে জেলে ঢোকানো হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি, রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার ভগ্নদশা মেরামত ও শক্তিশালী করা, যাতে আবারো তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম না হয়। বিশেষতঃ তার কেনা গোলামদের রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ক্ষমতাশালী করা যাতে, পোষা কুকুরদের কামড়া কামড়ি লাগলে লাগাম টেনে ধরা যায়।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রকে গণ প্রতিরোধ দমনে আরো সক্ষম করে তোলা। এজন্য জরুরী অবস্থা জারি করা হয়, নিপীড়ন ও দমন মূলক শ্রম ও সন্ত্রাস দমন আইন করা হয়, র‍্যাব-পুলিশকে ক্রস ফায়ারের নামে হত্যার লাইসেন্স দেয়া হয় এবং এই গণহত্যা জোরালো করা হয়।

সংস্কার দ্রুত এগিয়ে নেয়। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্র কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে। এর লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের উপনিবেশিক চরিত্রকে উপযোগী ও গভীর করা।

তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য বন্দর দিয়ে দেয়া চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদী সামরিক-রাজনৈতিক কৌশল "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে"র আওতায় ব্যর্থ রাষ্ট্র, নিরাপত্তা রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ধারণাগুলোর অধীনে সন্ত্রাস দমন আইন প্রণয়ন করে। ইসলামী জঙ্গীবাদকে উসকে দিয়ে এর ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত করা হয় আর বর্তমান সরকার এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে। এর আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক তাৎপর্য রয়েছে। অন্যদিকে, এই আইন এবং এই যুদ্ধের অংশ হওয়ার অর্থ হলো এদেশে (আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও) সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই নামান্তর।

সাম্রাজ্যবাদী নীলনক্সা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এই সরকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে দেশকে আরো গভীর সংকটে ফেলে। অর্থনীতিতে মন্দাভাব, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জনজীবনে চরম অবনতি ঘটায়।

এ সরকার শ্রমিকদের কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করে। কৃষক হয় দিশাহারা। নারী নীতিমালার নামে প্রহসনের জন্ম দিয়ে মৌলবাদকে উসকে দেয়। নারীকে কোনঠাসা করে। পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জনগণের উপর দমন-পীড়ন চালায়। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লাগে।

জরুরী অবস্থার মধ্যেও শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, ক্ষুদে ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরে জনগণ বারাবার জঙ্গী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই আন্দোলন এবং দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিগুলোকে দমনে এ সরকার ফ্যাসিস্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

জরুরী অবস্থার নামে জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়। বাক-স্বধীনতা থাকে না।

নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে দেশবিক্রি, অবৈধ ও গণবিরোধী কর্মকাণ্ড করেছে তার বৈধতা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতেও এসব কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার সুবন্দবস্ত করার লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়াশীল উপদলগুলোর মধ্যে একটা আপোষ-রফা করা। শুধু তা-ই নয়, ফখরুদ্দিন সরকার ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক সংস্কারের স্বার্থে নির্বাচনী আইন সংস্কার, সীমানা পূনঃ নির্ধারণ, উপজেলা নির্বাচন, মাইনাস ফর্মূলা, যোগ্যপ্রার্থী আন্দোলন, কিংস পার্টি গঠন, তাঁবেদার জাতীয় সরকার ফর্মূলা এবং জাতীয় সনদের আকারে ক্ষমতা-ভাগাভাগির রূপরেখা প্রদান করে।

সংবিধান সংশোধন, তাদের ক্ষমতা দখল ও কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রাপ্তি ও ক্ষমতার অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করতে ফখরুদ্দিন সরকার তথাকথিত "জাতীয় সনদ" রচনা করতে চেয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত গোপন আঁতাতের শর্তাবলীর তালিকায় পরিণত হয়। সর্বশেষে, তারা প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর সাথে আপোষরফা করে।

সুতরাং, ফখরুদ্দিন সরকারের অধীনে যে কোন সংলাপ, জাতীয় সনদ, নির্বাচন এবং গঠিত যে কোন ধরনের সরকার হলো ফখরুদ্দিন সরকারের অবৈধ, দেশবিক্রিকারী, ফ্যাসিস্ট, জাতীয় বিশ্বাসঘাতক কর্মকাণ্ডের বৈধতাদানের সংলাপ, সনদ, নির্বাচন ও সরকার। এসব কিছু হলো সাম্রাজ্যবাদী নীলনক্সা বাস্তবায়নের অংশ। এতে অংশগ্রহণ হলো জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা।

ক্ষমতার লোভে শাসকশ্রেণীর কিছু ছোটদল এবং সংশোধনবাদী দলগুলো ফখরুদ্দিন সরকারকে সমর্থন করে। এই সরকারের জাতীয় বিশ্বাসঘাতক, গণবিরোধী চরিত্র এবং এদের অবৈধ, দেশবিক্রিকারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী দলগুলোর সুস্পষ্ট কোন কর্মসূচি ও সংগ্রাম নেই। বরাবরের মত তারা ক্ষমতা ও লুটের ভাগ নিয়ে দরাদরি করে, আপোষ ও জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার পথ গ্রহণ করে।

এই অবস্থায় এদেশের জনগণের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে; তা হলো সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ এবং তাদের দালাল

জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেঃ

আপনারা শ্রেণী, স্তর, দল, মত, ভাষা, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এ*** যোগদান করুন, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের আজ্ঞাবহ দেশবিক্রেতা সরকারকে উৎখাত করুন, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন।

এদেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে-আপনারা এদেশের সবচাইতে অগ্রগামী শ্রেণী, আপনাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের জন্য ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এ*** যোগদান করুন।

প্রকাশ্যে ও গোপনে কার্যরত দেশপ্রেমিক বামপন্থীদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে-আপনারা এদেশের জনগণের অংশ। জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে পারস্পরিক সংগ্রাম সমন্বিত করার জন্য ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এর সাথে যুক্তফ্রন্টে*** যোগদান করুন।

বিভিন্ন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তি যারা এদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদেরকেও আহ্বান জানানো হচ্ছে ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হোন***।

সংগ্রামী কৃষক জনসাধাণের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে **জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চে** যোগদানের জন্য।

বিভিন্ন সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ এবং অন্যান্য সশস্ত্র, আধা সামরিক বাহিনীর দেশপ্রেমিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এর প্রতি সক্রিয় সমর্থন ও*** যোগদানের জন্য।

দেশপ্রেমিক প্রাক্তন মুক্তিবাহিনী, সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এ*** যোগদানের জন্য।

দেশপ্রেমিক সরকারী, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, ব্যবসা-বানিজ্য, শিল্পের সাথে জড়িতদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এ*** যোগদানের জন্য।

চতুর্থতঃ তীব্র শোষণ-নিপীড়ন ও লুণ্ঠনের যেসব প্রকল্প ও কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা সংকট গ্রস্থ হয়েছে তা মেরামত করা এবং গণরোষের ভয়ে অথবা চরম দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে যে সব চরম গণবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সংস্কার ও প্রকল্পগুলো অতীতের সরকারগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি তা দ্রুত কার্যকর করা, যাতে এদেশকে অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় এবং তা আরো গভীর করা যায় ।

এছাড়া তারা সামরিক, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে ।

এ সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য দেশবিক্রেতা ফখরুদ্দিন সরকার শাসকশ্রেণীর বর্তমান সংবিধানকে পদদলিত করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। এজন্য তারা জরুরী অবস্থার নামে চরম ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করে।

ফখরুদ্দিন সরকার দেশের তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন্দর, পরিবহন, যোগাযোগ, শিল্প, কৃষি, ব্যাংক, বাণিজ্যসহ সমগ্র অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়। এজন্য সাম্রাজ্যবাদী নানা সংস্থার দেয়া নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

রাজনৈতিক সংস্কারের নামে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত মিত্র সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে অন্যান্য নতজানু রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দুর্বল ও তাঁবেদার রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখতে চায়। ইতিমধ্যে তারা নির্বাচন কমিশন, দুদক ইত্যাদির মাধ্যমে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়। শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তিকে পঙ্গু ও দুর্বল করে। জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার দলিল হিসাবে তারা তথাকথিত "জাতীয় সনদ" এ সরকার ব্যবস্থাসহ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেয়।

তারা বর্তমান পুরোনো উপনিবেশিক-সামন্ত বাদী-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনী, প্রশাসনিক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকারের সাথে দুষ্ট আঁতাতে যুক্ত সুশীল সমাজ এবং তাদের গণমাধ্যম ও বিভিন্নমূখী প্রচারণা এই অবৈধ ফ্যাসিস্ট সরকারকে জাতির ত্রাণকর্তা, ধোয়া-তুলশীপাতা, দেশপ্রেমিক ইত্যাদি হিসাবে প্রচার করে। তারা এই সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা প্রণয়নের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে।

ফখরুদ্দিন সরকার তাদেরই গড়া সংবিধানকে পদদলিত করে। উল্লেখ্য, এই সংবিধান ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নিয়ন্ত্রণে, জনগণের কোনপ্রকার অংশগ্রহণ ছাড়া রচিত এবং পাকিস্তানি সামরিক ফ্যাসিস্টদের অধীনে নির্বাচিত ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রতি অঙ্গীকারকারী, ভারতের কাছে দেশবিক্রিকারী জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সাংসদদের দ্বারা অনুমোদিত। কিন্তু, এই সংবিধানও শাসকশ্রেণীর প্রতিটি সরকার পদদলিত করেছে।

ফখরুদ্দিন সরকার তাদের নিজেদের গড়া সংবিধানের আওতাতেও অবৈধ । তারা স্রেফ জরুরী আইনের বলে টিকে আছে ।

এভাবে দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব নয় । তাদের সামনে দু'টি পথ খোলা থাকে: হয় নির্বাচন দিতে হবে, নতুবা সামরিক আইন জারি করতে হবে ।

ফখরুদ্দিন সরকার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এমন অনেক কাজ করেছে যা তার আইনগত এখতিয়ারের বাইরে । ফলে এই সরকার এবং তার এখতিয়ার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বৈধতা ছাড়া সমগ্র পরিকল্পনাই ভেস্তে যেতে পারে ।

আর নির্বাচন দিলে তাদের সংকট হচ্ছে, আগামী সরকারকে দিয়ে এই সরকারের বৈধতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, আত্মরক্ষার্থে এই সরকারের লোকেদের আগামী সরকারে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে ।

ফখরুদ্দিন সরকার সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা বাস্ত বায়ন নিশ্চিত ও কন্টকমুক্ত করতে নির্বাচন ও সংলাপের আয়োজন করে। যার উদ্দেশ্য ছিল

আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদকে উৎখাতের লক্ষ্যে বর্তমান দেশবিক্রেতা, স্বৈরাচারী সরকার ও সকল বিশ্বাসঘাতকদের উৎখাতের জন্য সংগ্রাম করা । জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা: একটি উন্নত, প্রগতিশীল, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সংবিধান ও সরকার প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করা ।

৩

সমগ্র বাংলাদেশে আজ বিস্ফোরণ উন্মুখ পরিস্থিতি বিরাজ করছে ।

জনগণ আজ মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং তাদের আজ্ঞাবহ সরকারের নির্মম শোষণ-লুণ্ঠন ও ফ্যাসিবাদী অত্যাচার থেকে মুক্তি চান ।

কিছু বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আনসার, বিডিআর, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীও এই অবৈধ সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ।

কিছু বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্যে যুক্ত জনসাধারনও এ দেশবিক্রেতা সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ।

বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও এ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ।

সারা দেশের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদে চাকুরীজীবী, ক্ষুদে দোকানদার, হকার, জেলে, কামার, কুমার, তাতী এবং অন্যান্য পেশাধারী জনগণও এ স্বৈরাচারী সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ।

বিভিন্ন জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগণ ও নারীরা এই ফ্যাসিস্ট সরকারের উপর বিক্ষুব্ধ ।

অর্থাৎ, বাংলাদেশের সমগ্র জনগণ, শ্রেণী, দল, ভাষা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এ সরকারের উপর বিক্ষুব্ধ । এই ফ্যাসিস্ট সরকার এবং তাদের প্রভু মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উৎখাতের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম চলছে। জনগণের এ সংগ্রামকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ*** গঠন করা হয়েছে ।

এদেশের নারীদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এ*** যোগদানের জন্য ।

জাতিগত সংখ্যালঘু, ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ-এ*** যোগদানের জন্য ।

দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর আত্মগত অবস্থা এখনও যথেষ্ট দুর্বল । স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ অসংগঠিত । ফলে জনগণের সংগ্রাম প্রায় শূণ্য থেকে শুরু করে বিকশিত করতে হবে । তাই এটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে রূপ নেবে । যে সব স্থানে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে শত্রুর অবস্থান যেখানে দুর্বল সেখান জনগণের প্রতিরোধ ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে । এভাবে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্যদিয়ে দেশব্যাপী শত্রুর উৎখাত এবং জনগণের ক্ষমতা দখলের ভিত্তি প্রস্তুত করতে হবে ।

জাতির এই দুঃসময়ে দেশপ্রেমিক-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের সূচনা করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই । স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সংবিধান ও সরকার গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত এ সংগ্রামের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের নীলনক্সা বাঞ্চাল করা; সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে গোপন আঁতাত ও নীলনকশার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতারোহনকারী দেশবিক্রেতা সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করা ।

এজন্য ***জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ*** রাজনৈতিক, প্রচার, কূটনৈতিকসহ সংগ্রামের সবরকম রূপ ও সর্বোচ্চ রূপের সংগ্রামের মাধ্যমে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আজ্ঞাবহ সরকারকে উৎখাতের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে ।

অতীতের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এদেশের জনগণ অবশ্যই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কঠোর সংগ্রামে লেগে থাকবেন, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের তাবেদারদের উৎখাত করে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন ।

একটি উন্নত, প্রগতিশীল, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সংবিধান ও সরকার প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে

“জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ” গঠিত

৩৫ বছরের শোষণ-নিপীড়ন, দুর্নীতি ও দুঃশাসনে অর্থনৈতিক সংকট যখন চরমে পৌঁছে, প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর মধ্যকার হানাহানি গভীর সংকটের জন্ম দেয়, যখন এদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার তাগিদে শ্রমিক, কৃষক জনগণ বিদ্রোহ করতে শুরু করে, তখন প্রতিক্রিয়াশীলদের শোষণ ও নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। আর ঠিক তখন এক/এগারোর কু্য দেতা সংঘটিত হয়।

সিভিল পোষাকে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আশীর্বাদে বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীলনক্সা ও নির্দেশে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ তার কেনা গোলামদের সাহায্যে ভঙ্গুর শোষণ-নিপীড়ণমূলক ব্যবস্থাটাকে রক্ষা ও মেরামত করার জন্য নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করে। জারি করে জরুরী অবস্থা।

দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জনগণের আকুতিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে সোচ্চার কণ্ঠে কোন রাজনৈতিক দলকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল না। দেশ ও জাতির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা, জনগণকে সংগ্রামের দিশা দেখাবার মত কোন রাজনৈতিক শক্তি দৃশ্যমান হলো না। এদেশের গণরাজনীতির দুঃখজনক দুর্দশা এতে প্রকাশ পেয়েছে। একটি ক্ষুদ্র অংশের অনুচ্চকণ্ঠের প্রতিবাদ ছাড়া, ডান-বাম সকল রাজনৈতিক দলগুলোর কেউ কেউ সরকারের লেজ ধরে ক্ষমতায় যেতে চেয়েছে, কেউ আত্মরক্ষা ও ক্ষমতা ভাগের দরকষাকষি করেছে আর কেউ থেকেছে নিশ্চুপ। এখন এদের অধিকাংশ নির্বাচনের সমীকরণ নিয়ে ব্যস্ত।

এই ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে জাতি ও জনগণের সামনে যথাযথ রাজনৈতিক দিশা হাজির করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ। কেননা একটি সঠিক দিশার ভিত্তিতেই জনগণের সংগ্রাম বেগবান হওয়ার পথ পায়, জাতি ও জনগণের মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে যায়। এমন এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক শূণ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষে “জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ” গঠন করা অনিবার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

আজ বাংলাদেশের (পূর্ববাংলার) বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শ্রেণী, স্তর, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, দল, জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগণ অর্থাৎ দেশের সমগ্র জনগণ মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পরিকল্পনা ও নির্দেশে তাদের বিশ্বস্ত সামরিক বাহিনীর ক্যুদেতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উপদেষ্টা সরকারের বিচার দাবী করেন। জনগণ ১/১১-র পূর্বেকার চারদলীয় জোট ও মহাজোটের দুঃশাসনে ফিরে যেতে চান না। জনগণ সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অশুভ মিলনজাত নীলনকশার পাতানো নির্বাচন ও তদ্‌জাত অবৈধ সরকারেরও উচ্ছেদ কামনা করেন। এককথায়, সমগ্র জনগণ, শাসকশ্রেণীর রাজনীতি ও ক্ষমতার উচ্ছেদ কামনা করছেন। জনগণ এদের উৎখাতের লক্ষ্যে নানারূপে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু, সঠিক নেতৃত্বের অভাবে জনগণের সংগ্রাম বিকশিত হতে পারছেনা।

জনগণ চান এমন একটা নেতৃত্ব যা তাদের সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম ।

তাঁরা আরো আশা করেন, এ নেতৃত্ব হবে এমন একটি সংগঠন যা এদেশের সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণী, স্তর, ব্যক্তি, দল, জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগণের প্রতিনিধি সম্বলিত।

জনগনের এ আশা-আকাঙ্খা বিবেচনা করে প্রাথমিকভাবে জনগণের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক অংশের প্রতিনিধিরা এরূপ একটি সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সংগঠনের নাম রাখা হয় **‘জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ’**। গত ৭ নভেম্বর ২০০৮ প্রাথমিকভাবে উপস্থিত প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে ***‘জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ’***- কে সারা দেশব্যাপী সংগঠিত করা এবং অস্থায়ীভাবে এর কার্যপরিচালনার জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে। তরুণ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ মাসুদ খানকে সর্বসম্মতিক্রমে ***‘জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ’***-র আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়।

ক । র্ম । সূ । চী

●

জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষ্যে

সংবাদ সম্মেলন

বেলা ২ টা, শনিবার
৮ নভেম্বর ২০০৮
রিপোর্টার্স ইউনিটি

।

আপনিও আমন্ত্রিত

●

জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের দাবীর স্বপক্ষে মাসব্যাপী

প্রচারাভিযান

সফল করুন!

৮৪/ক/এ, সাদেক নগর, রায়ের বাজার ঢাকা-১২০৯। ০১৭১২৬৭০১০৯, ০১৭১৮৭৮৩৬৯৮। রাতুল বারী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। ৮.১১.০৮

বিশ্বাসঘাতকতার নির্বাচনঃ ডান-বাম দলগুলোর কার অবস্থান কোথায়?

আসন্ন নির্বাচন প্রশ্নে রাজনৈতিক শক্তিগুলো কি অবস্থান গ্রহণ করছে, তা দেখিয়ে দিচ্ছে তারা কতটা জনগণের রাজনীতি করে আর কতটা সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলোর সেবা করে। এই অবস্থান দেখিয়ে দেবে এই রাজনৈতিক শক্তি প্রকৃতপক্ষে কার প্রতিনিধিত্ব করছে।

আাসন্ন সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশার নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির অবস্থান ক্রমশঃ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

একেবারে প্রথমেই আ.লীগ এই সরকারকে বৈধতা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী মাইনাস ফর্মুলার প্রচেষ্টা এবং তা ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং ক্ষমতাসীন শক্তির সাথে আ.লীগের সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। হাসিনা, এরশাদসহ আ.লীগের নেতাদের সাথে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা রিচার্ড বাউচারের সাথে দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে। এখন তারা নির্বাচনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সর্বশেষ তারা জরুরী আইন প্রত্যাহারের দাবী থেকেও সরে এসেছে। গত ২ নভেম্বর আ.লীগ জাতি সংঘ মহাসচিব বান কি মুনকে জানিয়েছে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থাকে কেউ অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতে পারে না। ইতিপূর্বে এরশাদ জরুরী অবস্থার মধ্যেই নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। হাসিনা, এরশাদসহ তাদের দল নির্বাচনী তফশীল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে।

আওয়ামীলীগ নব্বইয়ের স্বৈরাচারী এবং বিশ্ববেহায়া এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশকে নিয়ে মহাজোট গঠনে অগ্রসর হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থপুষ্ট এনজিও এবং সাম্রাজ্যবাদের ধারণা ও পরিকল্পনার ফসল সম্মিলিত নাগরিক আন্দোলন এই জোটে যুক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা বাস্ত বায়নে তারা জোটের মধ্যে এবং সংসদে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসাবে কাজ করবে।

সৌদি সহযোগিতায় ইতিমধ্যে তারা ক্ষমতাসীনদের সাথে সমঝোতা করতে সক্ষম হয়েছে। সরকার তাদের খালেদা ও তারেককে ছেড়ে দেয়াসহ বেশ কিছু ছাড় দিয়েছে, বিনিময়ে তাদের কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শর্ত তারা আদায় করেছে। এই শর্তের অন্যতম হলো তারেক রহমানকে রাজনীতি ও দেশত্যাগ করানো, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সরকারের বৈধতা দেয়া।

বিএনপি ও জামাতের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। কারণ মহাজোটের সাথে ক্ষমতাসীন এবং তাদের প্রভুদের সমঝোতা হওয়ায় এবং দলের ভগ্নদশা নিয়ে তারা ক্ষমতায় যাওয়া দুরে থাক, ভালো অবস্থান ধরে রাখতে পারবে কি না তা নিয়েই তারা সংশয়গ্রস্ত। আবার নির্বাচন বর্জন করে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয় কি না তা- চিন্তা করছে। তারা নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা না দিয়ে যতটা সম্ভব সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি কৌশল গ্রহণ করতে পারে। একারণে তারা "ইসি নিরেপেক্ষ নয়","ষড়যন্ত্র চলছে", "নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে", "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরী করতে হবে" ইত্যাদি চোটপাট নিচ্ছে। যদিও তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি অব্যহত রেখেছে। সংলাপ করছে, দল নিবন্ধন করছে। জামাত তার মূলনীতি পাল্টে গঠনতন্ত্র সংশোধন করতেও পিছপা হয় নি। যদিও জাগপাসহ চারদলীয় জোটভুক্ত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা "নীল নকশার নির্বাচন", "পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চলছে" এ ধরণের বক্তব্য দিচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো জনগণকে পক্ষে টানা, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং আগামীতে সরকারের বিরোধীতা করার ভিত্তি রচনা করা। প্রকৃতপক্ষে, জোট এবং তার শরীকদের "নীল নকশা", "আধিপত্যবাদ" বিরোধী কোন কর্মসূচি নেই, বরং সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে ভালো সমঝোতা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা বাস্তবায়নের পথই বাস্তবে অনুসরণ করছে।

ড. কামাল হোসেন, কোরেশীরা মাইনাস টু এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা নিয়ে ক্ষমতায় যাবার আশা করছিল। তারা দুই জোটের সাথে সরকারের সমঝোতা দেখে এখন হতাশা ব্যক্ত করতে শুরু করেছে।

সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি শুরু থেকে এই সরকারের বিরোধীতা করে নি বরং স্বাগত জানিয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টি মহাজোটের সাথেই বরাবর রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ যারা ড. কামাল হোসেনকে স্যোশাল ডেমোক্র্যাট হিসাবে মূল্যায়ন করত; তারা স্বাভাবিকভাবে এই সরকারের ক্ষমতা দখল এবং কর্মকাণ্ডকে বুর্জোয়াদের সংবেদনশীল হয়ে ওঠার প্রগতিশীল কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসাবে মূল্যায়ন করে। তারা সরকার ও ইসির সাথে সংলাপেও অংশগ্রহণ করে। এভাবে তারা চোরের সামনে ধর্মের কাহিনী বয়ান করতে সক্ষম হয় এবং বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে।

সম্প্রতি ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো নির্বাচনী তফসীল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা ইসি-র দৃঢ়তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানায় এবং নির্বাচনকে ঘিরে অপশক্তির ষড়যন্ত্র বিষয়ে ইসিকে সতর্ক করে।

সিপিবি-র মনজুরুল আহসান খান বলেন, দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্বাচনের তফসীল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে অর্থবহ নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার করতে তিনি কিছু নির্বাচনী সংস্কারের দাবী করেন। বাসদ (খালেকুজ্জামান) বলেছে, তড়িঘড়ি তফসীল ঘোষণার কারণে নির্বাচন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ দল নিবন্ধন চূড়ান্ত হয় নি। উল্লেখ্য, বাসদের দল নিবন্ধন এখনও চূড়ান্ত হয় নি।

বাসদ (খালেকুজ্জামান) ছাড়াও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চাভূক্ত বাদবাকী শরীক দল ও সংগঠনগুলো এখনও পরিচ্ছন্ন অবস্থান ঘোষণা না করলেও নির্বাচনমূখী একটি প্রবনতা লক্ষনীয় বলে ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা যায়। বিগত দুই বছর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইস্যুতে সক্রিয় থাকলেও মূল রাজনৈতিক প্রশ্নে এই সংগঠনগুলোকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে দেখা যায় নি।

এই সরকার এবং সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশার বিরোধীতা করেছে যে কয়টি সংগঠন তার মধ্যে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল এবং এ.আই.ডি.ইউ. ভুক্ত সঙগঠনগুলো অন্যতম। তারা এ নির্বাচনকেও বিরোধীতা করে। তবে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে তাদের জোরালো কোন বক্তব্য বা কর্মসূচি দৃশ্যমান নয়।

আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ জরাজীর্ণ ও ভগ্নদশায় পতিত শাসকশ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থাটাকে রক্ষা, মেরামত ও শক্তিশালী করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলোর দিক থেকে এর অর্থ হলো এদেশ ও জনগণকে অবাধ লুণ্ঠণের ক্ষেত্র হিসাবে সংরক্ষণ করা। আর জনগণের দিক থেকে এর অর্থ হল আরো বেশী ক্ষুধা, দারিদ্র, শোষণ-লুণ্ঠন, দমন-নিপীড়ন। এই নির্বাচন হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশা বাস্তবায়নের অংশ। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পরিকল্পনা ও নির্দেশে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী সরকার এবং তাদের কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে এ নির্বাচন। সুতরাং, এর বিরোধীতা করা, কর্মসূচি হাজির করা হলো জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এবং জনগণের মুক্তির পক্ষে রাজনীতিকে বিকশিত করা। আর এই নির্বাচন, সংলাপে অংশগ্রহণ করা, ক্ষমতার জন্য আঁতাত করা, একে সফল করার জন্য মরিয়া হওয়া, নিশ্চুপ থাকা ইত্যাদি হলো সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা। জাতি ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

জনগণ এবং আন্তরিক নেতা কর্মীদের এই দুই অবস্থানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টানতে হবে। ভুল ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিহার করে সঠিক রাজনীতিতে সজ্জিত করতে হবে।

এসব ডান এবং বাম যে কোন সংগঠনেই আন্তরিক দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রী নেতা, কর্মী ও সমর্থক রয়েছেন। তারা জনগণের মুক্তির জন্য কাজ করেন। তারা নিশ্চয়ই বর্তমান এই ঐতিহাসিক সময়ে তাদের এবং তাদের দলের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করছেন। যারা ভুল বুঝতে পেরেছেন তাঁরা নিজেকে এবং দলকে সঠিক পথে এগিয়ে নেবেন– এটাই জনগণ আশা করে।